দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ২৮ JUL 2009
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৬

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি আরও নজর দিতে হবে

আহমেদ সুবীর

সংবাদপত্র সূত্রে প্রকাশ, দেশের ৫ হাজারেরও বেশি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকহীন অবস্থায় চলছে। সারাদেশের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৫ হাজারেরও বেশী। এর মধ্যে ৫ হাজারেরও বেশি প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। দিনে দিনে এ শূন্য পদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ বিদ্যালয়গুলোতে বহুদিন ধরেই সহকারী প্রধান শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এ খবরে আমরা বেশ চিন্তিত। কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকা মানে বিদ্যালয়টি কাণ্ডারি বিহীন। বিদ্যালয়ে নীতি নির্ধারণের জন্য প্রধান শিক্ষকের গুরুত্ব অনেক বেশী। একজন প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়টির অভ্যন্তরীণ নীতিমালা ও প্রশাসন কাঠামো যেমন করে প্রণয়ন করেন তেমিন বিদ্যালয়টিকে বাইরের প্রশাসন ও বোর্ডের সাথে সংযুক্ত রাখতে বিভিন্নভাবে কো-অর্ডনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। মাধ্যমিক ও পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে গড়ে বোর্ডের সামনে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা প্রধান। স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিদ্যালয়টিকে পরিচিত করান তিনি। বিদ্যালয়ে কোন প্রধান শিক্ষক না থাকলে ঐ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দিয়ে যখন প্রধান শিক্ষকের কাজ করতে হয় তখন পদে পদে নীতিনির্ধারণগত জটিলতায় হোঁচট খেতে হয় এবং সর্বোপরি বিদ্যালয়টির শিক্ষা পরিবেশের ক্ষতি হয়। স্থায়ী অভিভাবক ব্যতীত কোন পরিবার যেমন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না ঠিক তেমনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকও কোন বিদ্যালয়ের সার্বিক দায়িত্ব সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আইনগত কারণে পালন করতে পারেন না। সহকারী শিক্ষক বা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়টিকে ঠিকমতো মেলে ধরতে পারেন না বা দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করতে দ্বিধায় ভোগেন। এর ফলে পাঠ্যরত ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ে। এ ছাড়াও কোন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকা মানেই অনেক সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

তবুও এভাবেই চলছে দেশের ৫ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয় প্রায় বার-চৌদ্দ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকহীন অবস্থায় চলছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেমন- এসব বিদ্যালয়ে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে, যারা ঠিকমতো পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি পরীক্ষা দেবার জন্য অন্য শহরে যেতে হয়। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য অনেক সময় পরীক্ষা ঠিকমতো দিতে অসুবিধা হয়। কেন্দ্রে ঠিকমতো থাকার স্থান পায় না। এর জন্য তাদের পরীক্ষা দিতে অসুবিধা হয়।

মাধ্যমিক বা এইচএসসি সমমানের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হবার নীতিমালা শেখবার প্রণীত হয় ১৯৯৫ সালে। ঐ আইনে একজন প্রধান শিক্ষক নিয়োজিত হবার নিয়ম এভাবে প্রণীত হয় যে, শিক্ষক হিসেবে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে তিনি প্রধান শিক্ষক হতে পারবেন। কিন্তু দেখা গেছে, ১৫ বছর শিক্ষকতা করবার পর আরো ৩ বছর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে করতে অনেক শিক্ষক অবসরে যান। এ কারণে প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করার সুযোগ খুব কম শিক্ষকের হয়ে ওঠে। এভাবে দীর্ঘদিন চলার কারণে এ শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে ১৯৯৫ সালে আইন প্রণীত হওয়ার অনেক কারণ ছিল। এতে বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপও ছিল। যেমন এমপিওভুক্ত শিক্ষক মারা গেলে বা অবসর গ্রহণ করলে তার স্থানে নতুন কোন শিক্ষক বা কর্মচারী নিয়োগ দেয়া যাচ্ছিল না। এ শূন্যতা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। তাছাড়া সে সময়ে দেখা গিয়েছিল, গ্রামের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০-২৫ জন শিক্ষার্থী মাত্র। নামমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে সরকারি অনুদান নেয়ার ঘটনাও বিরল নয়; এ অবস্থায় শিক্ষার মান বজায় রাখতে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়গুলোর প্রতিটি শ্রেণীতে ৭০ থেকে ৮০ জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির বিধান করে। কিন্তু এতেও সে সময় অসুবিধা ছিল। এতো মফিস্বলে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলন করা সে সময়ের গ্রামের স্কুলগুলোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া শাখা খোলার ব্যাপারে সে সময় বেশ কঠিন শর্ত জুড়ে দেয়া হয়।

সম্প্রতি সরকার শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিল করেছেন। পরে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তও শিথিল করা হয়। এতে অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। তবে শিক্ষক সমিতিগুলো ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামোর নীতিমালার পুরোপুরি বিলুপ্তি চান। দু'দিক দিয়েই বিষয়টি আমাদের কাছে বিবেচনার দাবী রাখে। এখনো দেশের বিভিন্ন পাড়া-গাঁয়ে অনেক বিদ্যালয় আছে, যেখানে পর্যাপ্ত ছাত্রছাত্রী নেই। আবার দেশের অনেক বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে অজস্র ছাত্রছাত্রী থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রধান শিক্ষক নেই, নেই কোন উন্নতমানের ল্যাবরেটরি, নেই ছাত্রছাত্রীদের খেলার বা স্কাউটিং-এর কোন ভাল শিক্ষক।

এজন্য দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য নতুন নীতিমালা প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এতে করে দেশের ২৫ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় এক ধরনের প্রশাসনহীন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ধরনের অভিযোগ থেকে সরকার মুক্ত থাকতে পারবে বলে আমরা মনে করি।

এক. উপজেলা অফিসগুলোতে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কতটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, তার পরিসংখ্যান ও ছাত্রছাত্রী সংখ্যার হিসাব নিয়মিত রাখতে হবে। সেখানে কতজন শিক্ষক ও এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রাখতে হবে। সরকার কর্তৃক মাসিক ভাতা কত দেয়া হয়, তারও হিসাব রাখতে হবে।

দুই. স্থানীয় প্রশাসনকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সচেতন রাখতে হবে এবং দু'জন সরকারী গেজেটেড অফিসারকে স্থানীয় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে।

তিন. ইন্সপেক্টর অব স্কুলস-এর নিয়মিত মাসে একবার করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তদারকির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

চার. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষকদের নিয়োগ রাখতে হবে।

পাঁচ. কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক ও নির্দিষ্ট পরিমাণে শিক্ষক না থাকলে তার যথাযোগ্য নিয়োগ দান শীঘ্র দিতে হবে।

ছয়. কোন স্থানে পাশাপাশি একাধিক বিদ্যালয় থাকলে এবং যথেষ্ট পরিমাণে ছাত্রছাত্রী না থাকলে এমন দু'তিনটি বিদ্যালয়কে একীভূত করতে হবে।

সাত. প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তার মান নির্ধারণের জন্য মাঝে মাঝে বোর্ড বা উচ্চ পর্যায় থেকে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

আট. শিক্ষকদের প্রদত্ত শিক্ষার মান অনুসারে তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

নয়. শিক্ষিত, সৎ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠন করতে হবে।

দশ. শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের অবশ্যই রাজনীতিমুক্ত থাকতে হবে।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড বলে আমরা বহুকাল থেকে বলে আসছি, ছাত্রছাত্রীরা পড়ে আসছে, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে আমরা এসব বলে আসছি— এসবের বাস্তব রূপ দিতে হলে আমাদের দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে, শিক্ষাদান পদ্ধতির দিকে, শিক্ষকদের সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

শিক্ষা খাতের সবচেয়ে সংবেদনপূর্ণ এবং জরুরি বিভাগটি হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ। পৃথিবীর প্রায় সবদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এ সংক্রান্ত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তৈরী করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যেন এর উল্টো। কথার ফুলঝুরির অভাব না থাকলেও মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বাস্তবমুখী পদক্ষেপে যথেষ্টই অভাব রয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষা জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ অংশটিতে কোন ফাঁক থেকে গেলে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাই হুমকির মুখে পড়বে। সরকার ঘোষিত ২০২১ সালের উন্নত বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা ও গুরুতর ঘাটতিগুলোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।